প্রথম অধ্যায়
মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিবর্তন

মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাধারণ পরিচয়

আধুনিক বাংলার ইতিহাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার পশ্চাতে রয়েছে এই সামাজিক শ্রেণির অবদান। 'মধ্যবিত্ত' এই শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে এই সামাজিক শ্রেণি সমাজ বিন্যাসের মধ্যবর্তী স্তর। অর্থাৎ এর ওপরে একটি এবং এর নিচে আর একটি স্তর — মধ্যবর্তী রেখায় এর অবস্থান। অন্যভাবে বলা যায় এই শ্রেণির মানুষের বিত্তের পরিমাণ মাঝারি ধরণের — এদের অতিবিত্ত নেই, আবার এরা বিত্তহীনও নয়। এদের ওপরে বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণি আর নীচে কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির মানুষরা। এই দুই শ্রেণি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মার্ক্সের ব্যাখ্যায় ''মধ্যবিত্ত শ্রেণি হল এক জনগোষ্ঠি যারা উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষ স্থান গ্রহণ করে থাকে। উৎপাদনের উপাদানের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থাকে। অন্যকে শোষণ করে বা শোষিত হয় এবং উৎপাদনের অংশ পেয়ে থাকে। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, উৎপাদনের অংশ ভোগকারী এই শ্রেণি মূলতঃ এক অর্থনৈতিক গোষ্ঠি।''[১] অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকেই এর অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়। আর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ''মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিজস্ব বিশেষ অর্থনৈতিক স্বার্থ থাকতে পারে; এরা উৎপাদনের উপাদানের মালিক হতে পারে বা নাও হতে পারে। এদের বিশেষ পেশাগত নৈপুণ্য থাকতে পারে। সব মিলিয়ে এরা এক সামাজিক শ্রেণি গঠন করে। সমাজ বিন্যাসে মর্যাদাগোষ্ঠি জীবনচর্যার বিশেষ উৎকর্ষ বা অপকর্ষের ফলে গড়ে ওঠে। জীবন ধারণের এক বিশেষ ধরন থেকে এই সামাজিক গোষ্ঠির উদ্ভব হয়। জীবনযাত্রার বিশেষ ধরন — ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, আচার-আচরণ, পেশা ও জীবনদর্শন থেকে এরূপ বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক গোষ্ঠির আবির্ভাব হয়।''[২]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদী বিকাশের পীঠস্থান ইংলন্ডের দিকে তাকালে দেখা যায় — ''ইংলন্ডে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে বুর্জোয়ারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত হত।

সেখানে এমন হবার কারণ বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী সঞ্চয় থেকেই সম্পদের মালিক হয়। কিন্তু ভূ-স্বামীরা সনাতন ভিত্তিতে কেবল ভূমি নিয়ন্ত্রণেরই ওপরে নির্ভরশীল থেকে যায়। ভূমি-নির্ভর না হয়ে এবং ভূ-স্বামী বা 'ব্যরণ'দের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত স্বাধীন অবস্থান নেওয়ায় সেখানে 'বুর্জোয়া'রা মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসাবে আখ্যায়িত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ইংলন্ডে বা অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে, এমন কি বর্তমান যুগের ভারতেও বুর্জোয়ারা সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা ভোগকারী প্রভাবশালী শ্রেণি এবং এখন তাই সেসব দেশে মধ্যবিত্ত বলতে বোঝায় 'পেটি বুর্জোয়া'দেরকে।"[৩]

ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইংলন্ডের ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন হয়। ফলে পরাধীন ভারত বা বাংলাদেশের সমাজ বিকাশ ইংলন্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজ বিকাশ থেকে ভিন্নতর হওয়ায় অনেকে 'বুর্জোয়া' শব্দটি বাংলাদেশের প্রগতিশীল বাণিজ্যিক শ্রেণির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে কিন্তু চাননি তবে "একথা সত্য যে পাশ্চাত্যে বুর্জোয়ারা সমাজ-পরিবর্তনের কর্মকান্ডে স্বাধীন যে ভূমিকা পালন করেছে অন্য দেশের বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতের মধ্যবিত্ত তেমন স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়নি। এ ছাড়া আধুনিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মনকেও সাধারণভাবেই মধ্যবিত্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ মাপকাঠিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নির্দেশ করলে পরাধীন বাংলার সমাজ-বিকাশের সত্যকে যেমন অস্বীকার করা হয়, তেমনি একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তঃভুক্ত অনেকেই মধ্যবিত্ত নামে আখ্যায়িত হবার যোগ্য বিবেচিত হয় না। ফলে এক ধরণের সংকীর্ণতা প্রশ্রয় পায় বলেই ধারণা করা যায়।"[৪]

মধ্যবিত্ত শব্দটিকে সীমাবদ্ধ অর্থে প্রয়োগ না করে একটু বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করলে আমরা দেখি যে কায়িক শ্রম না করে শ্রমজীবীদের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল এবং প্রচুর বিত্ত বা বিরাট শিল্পের মালিকহীন ব্যক্তিকেই আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। তবে মধ্যবিত্তের কোন কোন অংশ আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

যে কোন সমাজে বিত্তবান ও বিত্তহীন এ দুটি প্রধান শ্রেণির মধ্যবর্তী স্তরে দায়িত্বশীল অভিন্ন স্বার্থের জন সম্প্রদায়কেই সাধারণত মধ্যবিত্ত বলা হয়। প্রতিটি শ্রেণি-বিভক্ত সমাজেই বিত্তবান ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠির মধ্যে সংযোগ সেতু হিসাবে যাদেরকে দেখা যায়, তারাই সাধারণ অর্থে মধ্যবিত্ত।

যে কোনও আধুনিক সমাজের মধ্যবিত্তকে মূলতঃ চারটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা যায় ঃ ক) বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত; খ) শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত; গ) ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত; ঘ) পেশাজীবী (শিক্ষিত)

মধ্যবিত্ত। তাছাড়া আর্থিক অবস্থানের বিচারে এসব উপবিভাগীয় মধ্যবিত্তকেও আবার উচ্চমধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এ দুভাগে ভাগ করা সম্ভব। ভারত বা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের সাম্প্রদায়িক বিভক্তিকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এদেশে প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় — হিন্দু ও মুসলমান; অতএব সামাজিক অর্থনৈতিক এবং অবশ্যই ঐতিহাসিক কারণে হিন্দু মধ্যবিত্ত ও মুসলমান মধ্যবিত্ত — এভাবেও বিষয়টিকে ভাবা হয়।

ক. বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত ঃ

এদেশে বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয় ইউরোপীয়দের আগমণের পর থেকে। বিনয় ঘোষের মত অনুযায়ী বলা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপীয়রা এদেশের সঙ্গে স্থায়ী বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। বাংলার সূতিবস্ত্র, রেশম, চিনি, সোরা ও আফিম তারা পশ্চিমে, পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করতে থাকে। এই বাণিজ্য লাভজনক হওয়ায় তারা বংলার ঢাকা, কাশিম বাজার, নোয়াখানি, হুগলি, কলকাতা, বর্ধমান, মালদা, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরে কুঠি বা বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ ও আমদানি পণ্য বিক্রি করতে শুরু করে দেয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিক থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির বাংলা বাণিজ্যে লাভের অঙ্ক ক্রমশ বাড়তে থাকে। এ সময় থেকে তাদের কর্মচারীরাও ব্যক্তিগত ব্যবসা গড়ে তুলতে মনোযোগী হন। কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরে যথাক্রমে ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনেমারদের প্রধান বাণিজ্যিক উপনিবেশগুলি স্থাপিত হয়। দুর্গ বানিয়ে স্থানগুলিকে সুরক্ষিত করা হয়। প্রথম থেকে এই উপনিবেশগুলি ঘিরে এদেশীয় বণিক, মহাজন, দালাল-গোমস্তা, মুৎসুদ্দি, সরকার ও বেণিয়ানরা ভিড় করতে থাকে। আধুনিক বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছিল এই ইউরোপীয় বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে। পরবর্তীকালে এই সদ্যোজাত মধ্যবিত্ত বাংলার জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে পণ্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে জমায়েত হয়।

বাংলাদেশে ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এদেশে বাণিজ্য ও শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের বিকাশ দ্রুত হতে থাকে। এজন্য কোম্পানির প্রশাসনিক নীতি অনেকখানি সহায়ক হয়। রেগুলেটিং এ্যাক্টের (১৭৭৩) বিধান অনুযায়ী কলকাতায় সারা ভারতের রাজধানী স্থাপিত হয়। কলকাতা হয়ে ওঠে পূর্ব-ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। অনেকগুলি এজেন্সি হাউস কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই এজেন্সি হাউসগুলি ছিল ইউরোপীয় বাণিজ্যের হৃৎপিন্ড। এরা ব্যাঙ্কিং কমিশনের ব্যবসা, জাহাজ পরিবহণ ও বাণিজ্য বীমার কাজ করত। এদের সহযোগী হলেন বাঙালি বণিকেরা।

বাংলায় ছিল ইউরোপীয় বাণিজ্যের উপযোগী বিশাল ও উন্নত বাজার। বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এ বাজার গড়ে উঠেছিল। জল ও স্থলপথে নৌকা, বলদ ও ঘোড়ার গাড়িতে বিপুল পরিমাণ পণ্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে দেওয়া-নেওয়া চলত। বড় বড় আড়তদার, গোলাদার, দালাল, পাইকার থেকে ছোট ছোট ফড়িয়া, বেপারি, দোকানদার ও ব্যবসায়ী বাংলার অভ্যন্তরীন ও বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাংলার আন্তর্বাণিজ্যের বাজার ছিল দু-ধরনের স্থানীয় ও আমদানি-রপ্তানী। বিদেশে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের কেনা-বেচার জন্য আলাদা বাজার ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোম্পানির নতুন বাণিজ্য নীতির ফলে বাংলার গ্রামে গ্রামে অসংখ্য নীল ও রেশমের কারখানা গড়ে ওঠে। এগুলি পরিচালনার জন্য তাদের দরকার হল প্রচুর গোমস্তা, সরকার, কনট্রাক্টর, দালাল ও পাইকার। কিন্তু ''ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের অভ্যন্তরে ইউরোপীয়দের অবাধ প্রবেশ ও বাসবাস পছন্দ করত না। অইংরেজ কোন ইউরোপীয়, স্বাধীন বণিক ও পর্তুগীজদের দেশের অভ্যন্তরে বসবাসের অনুমতি হত না। এমন কি বাঙালি ছাড়া অন্য কোন ভারতীয়কে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগের অনুমতিও দেওয়া হত না। কোম্পানির এই নীতি বাঙালি মধ্যবিত্তের সামনে বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়।''[৫] সরকারে এই নীতির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালি বণিক ও মহাজনদের মধ্যে নবকৃষ্ণ দেব (শোভাবাজার রাজ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা), কৃষ্ণকান্ত নন্দী (কাশিমবাজার রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা), মদনমোহন দত্ত (হাটখোলার দত্ত পরিবার) ও রামদুলাল দে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে এঁদের বংশধররা জমিদারি কিনে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সরে আসেন। আশুতোষ দে, মতিলাল শীল, মাণিকরাম বসু, কাশীশ্বর মিত্র, বনমালী সরকার, গোকুলচন্দ্র মিত্র, শোভারাম বসাক, কমল নয়নচাঁদ মল্লিক ও তাঁর পুত্রেরা গৌরচরণ ও নিমাইচরণ, প্রীতিরাম দাস ও তাঁর পুত্র রাজচন্দ্র দাস (রাণী রাসমণির স্বামী) সকলেই ব্যবসা, দালালি ও পণ্য সরবরাহ ব্যবসা করে অর্থশীল হন।

খ. শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত ঃ

বিশ শতকের বাংলাদেশে যে আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠে তার তিনটি বিভাগ — ভারী মূলধনী শিল্প (কয়লা ও লোহা), রপ্তানি প্রয়োজনে গড়ে ওঠা শিল্প (পাট ও চা) এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প (কাগজ, চিনি, বস্ত্র)। এছাড়া ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, তেলকল, ময়দাকল, চামড়া শিল্প, কেমিক্যাল, সাবান, দেশলাই ইত্যাদি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এসব শিল্পের বেশিরভাগ ছিল ইউরোপীয়দের হাতে। ইউরোপীয়দের পরিচালনায় ও মূলধনে এগুলি গড়ে ওঠে, লভ্যাংশ ভোগ

করত ইউরোপীয়রা। আর বাংলার প্রবীণ শিল্পগুলি ছিল রপ্তানিমুখী। পাট, চা ও কয়লা শিল্পের উন্নতি প্রধানত বিদেশের বাজারের চাহিদার ওপর নির্ভর করত। বিদেশের বাজারে এসব পণ্যের চাহিদার ঘাটতি দেখা দিলে বাংলার শিল্পে মন্দা ও ছাঁটাই শুরু হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে এবং তিরিশের দশকে বিশ্বের বাজারে পাটের চাহিদা কমে গেলে বাংলার পাট শিল্পে মন্দা, ছাঁটাই ও অশান্তি দেখা যায়। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে যখন ইউরোপীয় মূলধন স্বদেশে পাড়ি দিতে থাকে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গড়ে ওঠা এদেশীয় পুঁজি বাংলার শিল্পে লগ্নি শুরু হয়। বাংলার পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বস্ত্রশিল্পে ভারতীয় পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে। এ পুঁজি বেশিরভাগই ছিল মাড়োয়ারি পুঁজিপতিদের।

শিল্প প্রযুক্তি ও শিল্পস্থাপন সম্পর্কে বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে প্রবল হাতাশার সৃষ্টি হয়। বাংলা সরকার এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হতাশা দূর করবার জন্য ইন্টাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলার জমিদার, দেশপ্রেমিক ও মিশনারীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করে এদেশীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের শিল্পশিক্ষা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সরকার এসব প্রতিষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি, অনুমোদন ও অনুদান দান করে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৫-১৯১১) বাংলার বুদ্ধিজীবী ও দেশবরেণ্য নেতারা এদেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে যত্নবান হন। দেশের মধ্যে যেমন টেকনিক্যাল এডুকেশনের ব্যবস্থা হল তেমনি বাঙালি ছাত্রদের বিদেশে পাঠিয়ে আধুনিকতম প্রযুক্তি কৌশল আয়ত্ত করার দিকেও নজর পড়ে। এদেশে নতুন নতুন স্বদেশী শিল্প গড়ে ওঠে। বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্থাপন করেন 'বেঙ্গল কেমিক্যালস', নীলরতন সরকার চামড়ার কারখানা, 'বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস', মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 'বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস'। ভাগ্যকুলের রায়েরা বাষ্পীয় পোতে নৌপরিবহন ব্যবসায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে সক্ষম হলেন। প্রমথনাথ রায় স্থাপন করলেন 'ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরি'। বাঙালির এই স্বপ্নের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু বেশিদিন স্থায়ি হয়নি। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাদে আর সব শিল্প অল্পদিনে বন্ধ হয়ে যায়। বাঙালির শিল্পোদ্যোনের এই ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। বলা যায় প্রধানত দুটি কারণে বাঙালির শিল্প প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। প্রথম থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে পুঁজির অভাব ছিল। বাঙালি পুঁজিপতিরা এগুলিতে যথেষ্ট মূলধন লগ্নি করেননি। অপর কারণটি হল শিল্প পরিচালনায় অভিজ্ঞতার অভাব। বাঙালির শিল্প পরিচালনার অভিজ্ঞতা তৈরি হয়নি। তাই সাধারণভাবে শিল্পক্ষেত্রে বাঙালির অনগ্রসরতা রয়ে গেল।

গ. ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণি ঃ

বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের ধারাটি ছিল এদেশের ভূমিব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের (১৭৯৩ খ্রিঃ) পর থেকে ধীরে ধীরে ভূম্যধিকারী মধ্যবিত্তের প্রসার ঘটতে থাকে। মুঘল যুগের শেষদিকে বাংলার ভূমিব্যবস্থায় জোতদার, মন্ডল, হাওলাদার, গাঁতিদার প্রভৃতি মাঝারি বা ছোট জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে বৃহৎ জমিদারদের অধীনে এদের স্থাপন করা হয়। কর্ণওয়ালিশ নতুন ভূমি বন্দোবস্তে এই অধীনস্থ তালুকদার ও গাঁতিদারদের অধিকার রক্ষা করে বাংলাদেশে এক নতুন সামাজিক শ্রেণির উত্থানের পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন। ইংলন্ডের গ্রামীণ সম্পন্ন ভূস্বামীর মত এদেশেও একটি মধ্যস্তরবর্তী ভূমি-নির্ভর সামাজিক শ্রেণির প্রতিষ্ঠা তাঁর কাম্য ছিল।

এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর প্রথম যে সমস্যাটি দেখা দেয় তাহল বাংলার বড় জমিদাররা সময়মত ভূমিকর আদায় করতে ও সরকারি রাজস্ব জমা দিতে পারলেন না। কঠোর সূর্যাস্ত আইনে (Sunset law) তাদের নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে ভূমিরাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হত। এদেশের জমিদারদের প্রশাসনিক কাঠামো ছিল বেশ ঢিলেঢালা। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সরকারি রাজস্ব জমা দেওয়ার মানসিকতা তাদের ছিল না। এদেশের কৃষকদের মধ্যেও এই নিয়মমানুবর্তী মানসিকতার অভাব ছিল। চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত চালু হওয়ার বিশ বছরের মধ্যে এদেশের বৃহৎ জমিদারিগুলির এক-তৃতীয়াংশ নিলামে বাকি রাজস্বের দায়ে বিক্রি হয়ে যায়। জমিদাররা সময় মতো সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করা নিয়ে মহাসমস্যায় পড়েন। বড় জমিদাররা এই সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন দু-ভাবে। সপ্তম ও পঞ্চম আইনের (১৭৯৯ ও ১৮১২ খ্রিঃ) আশ্রয় নিয়ে রায়তের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে ভূমিকর আদায়ের ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নিলেন। এদেশে প্রচলিত পত্তনি ব্যবস্থারও সাহায্য নেওয়া হয়। বর্ধমানে জমিদার প্রথম ব্যাপকভাবে এই পত্তনি ব্যবস্থা চালু করেন। জমিদারি খন্ডে খন্ডে ভাগ করে মধ্যস্বত্বভোগীর সঙ্গে পৃথকভাবে ভূমিকরের বন্দোবস্ত করা হয়। মধ্যস্বত্বভোগী বার্ষিক নির্দিষ্ট ভূমিকরের বিনিময়ে পত্তনি স্থায়িভাবে ভোগদখল করার অধিকার পান।

এই পত্তনি ব্যবস্থা বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের পথ তৈরি করে দেয়। এই ব্যবস্থা ক্রমশ বাংলার অন্যান্য জেলাতেও ছড়িয়ে এবং খুবই জনপ্রিয় হয়। এদেশের বণিক, মহাজন, গোমস্তা এবং পরবর্তীকালে উকিল, ব্যরিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার প্রভৃতি পেশাদার ব্যক্তিরাও এই পত্তনি নিতে শুরু করেন। এই শ্রেণির লোকেরা তালুকদারি, গাঁতিদার, হাওলাদারি স্বত্ব কিনে নিয়ে নিজেদের

সামাজিক মর্যাদা ও সাংসারিক আয় দুই-ই বাড়ানোর চেষ্টা করলেন।

বাংলাদেশের পত্তনি, তালুকদারি বা গাঁতিদারি ব্যবস্থা থেকেই শুধু মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়নি। বাংলার ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্তের উত্থানের পশ্চাতে আছে এদেশের হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার আইন। ইংলন্ডে জমিদারের মৃত্যুর পর তার পুত্রদের মধ্যে জমিদারি ভাগ হয় না। সেখানে জ্যেষ্ঠপুত্র জমিদারি লাভ করেন। অন্য পুত্র বা কন্যারা জীবনধারণের উপযোগী ভাতা পান। বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে জমিদারি ভাগ হত। এটাই ছিল এদেশের প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন। এ ধরণের উত্তরাধিকার আইনের জন্য বাংলাদেশে জমিদারি খন্ডীকরণ শুরু হয়। জমিদারি ক্রমশ ভাগ হওয়ার ফলে উনিশ শতকের তৃতীয়পাদে বাংলার মোট জমির দুই-তৃতীয়াংশ উপস্বত্বভোগী জোতে পরিণত হয়। ঠিক এ সময়ে যশোরের অনেকগুলি জমিদার পরিবাররের সম্পত্তি বারবার ভাগ হওয়ার ফলে ঐ পরিবারগুলি দুর্বল বা ধ্বংস হয়ে যায়।

শুধু তাই নয় বাংলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষিজমি বাড়ানো সম্ভব ছিল না। চাষযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ক্রমশ কমে এল। তাই কৃষিজমির চাহিদা বাড়ল বিপুলভাবে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সম্পন্ন কৃষকদের একাংশ জমি বর্গা বন্দোবস্ত দিয়ে সুদের কারবার বা কৃষিজ পণ্যের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করলেন। এঁরা ভাগচাষের আয়, সুদের কারবার ও বাণিজ্য থেকে সংগৃহিত সম্পদে নিজেদের সংসার নির্বাহ করতেন। এভাবে সমাজবিন্যাসে গতিশীলতা এল। আচার-আচরণ, বেশভূষা, জীবনযাত্রা, শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক রীতিনীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষক মধ্যবিত্ত হলেন।

বাংলার ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্তের আর একটি স্তর হল গ্রামের মহাজন। এদেশে প্রবর্তিত নতুন ভূমিব্যবস্থা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জমির নতুন মর্যাদা বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপাদন এদেশের কৃষককে ক্রমশ মহাজনদের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। উনিশ শতকে কড়াকড়ি করে খাজনা আদায় শুরু হয়। বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপাদনও বাড়ে। কৃষকদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এদেশের কৃষকদের নানা কারণে মহাজনদের কাছ থেকে সহজ ঋণ পাওয়া যেত এবং এই ঋণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কোন বাধা ছিল না। তাছাড়া মহাজনরা ছিলেন গ্রাম-বাংলার জমিদার, বণিক ও গ্রামপ্রধান। গ্রামের মোড়ল শ্রেণির লোকেরা সুদের কারবার, জমির দেখাশুনা এবং কৃষিজ পণ্যের ব্যবসা একসঙ্গে পরিচালনা করতেন। এঁদের কাছে নানাভাবে উপকৃত কৃষক সমাজ 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র অপেক্ষা এঁদের ঋণ দিতে বেশি আগ্রহ দেখাত। বিট্রিশ ভূমিব্যবস্থা, বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন এবং কৃষিকাজের সম্প্রসারণ উনিশ শতকে মহাজনদের জন্য

স্বর্ণযুগ নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বাংলার মাঝারি ও ছোট জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদার, পত্তনিদার, হাওলাদার, জমির অকৃষক মালিক, সুদের ও শস্যের কারবারী মহাজন সকলেই ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্ত। ভূমি-নির্ভর এই সামাজিক গোষ্ঠির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত এই সমাজ কৃষির উন্নতিতে কোন পুঁজি বিনিয়োগ করেনি। ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্তের বিকাশের পক্ষেও ব্যবস্থা আদৌ মঙ্গলজনক হল না।

ঘ. পেশাজীবী মধ্যবিত্ত ঃ

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে এক শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হয়। ফরাসি বিপ্লবের নায়ক ছিল বুর্জোয়ার। শিল্প ও বাণিজ্যাশ্রয়ী এই মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারীদের আধিপত্য ও নাগপাশ থেকে রাষ্ট্র ও জাতিকে মুক্ত করে নিজেরা নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এদের সঙ্গে যোগ দেন আইনজীবী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ ও সাংবাদিক। এই পেশাদার মধ্যবিত্তের সমর্থন পেয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেদের ভিতরকার সামাজিক বিভেদ সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে। জার্মানি, ইতালি, ইংলন্ড ও অস্ট্রিয়াতেও মধ্যবিত্তের কার্যকরী সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় পেশাদার মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ খুব সহজ ও সাবলীল ছিল না। এদেশে পেশাদার মধ্যবিত্তের উত্থানের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল প্রথাগত ধর্ম ও জাতিভিত্তিক সমাজ। এদেশের ব্রাহ্মণ ও মৌলবীরা বহুকাল ধরে শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বৈদ্য, উনানী-চিকিৎসক ও হেকিম বংশপরম্পরায় চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিজেদের গোষ্ঠিগত সম্পত্তি করে রেখেছিলেন। আইনের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা ছিল পন্ডিত ও মৌলবী শ্রেণির কুক্ষিগত। ব্রিটিশ শাসন এই প্রথাগত পেশাগুলিকে মুক্ত করে এগুলির বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হল। শিক্ষা, চিকিৎসা ও আইন — পেশাদারি বৃত্তির তিন প্রধান স্তম্ভ — ধর্ম ও রক্ষণশীল সামাজিক বেষ্টনী থেকে হয়ে বৃহত্তর কর্মকান্ড ও সামাজিক পরিবর্তনের সুযোগ করে দিল। যেকোন বর্ণ ও ধর্মের মানুষ যেমন এসব পেশা গ্রহণ করতে পারল, বর্ণগত পেশার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পেশাগত গতিশীলতা অনেকগুণ বেড়ে গেল। আবার পেশাগত গতিশীলতা বর্ণগত গতিশীলতা এনে দিল। প্রাচীন রক্ষণশীল প্রথাগত সমাজের অনেক শক্ত প্রাচীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই গতিশীলতা এল আরো একটি কারণে। বাংলার প্রথম ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়। বাংলা থেকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। বাঙালি শিক্ষক, আইনজীবী

ও ডাক্তার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ — বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এসব অঞ্চলে তখন পেশাদার মানুষের খুব কদর ছিল। বাঙালি পেশাদার মানুষরা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের জয়যাত্রাকে সুনিশ্চিত করে নেয়। উত্তর ও মধ্য ভারতের বড় বড় শহর — কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, আগ্রা, ভূপাল, জব্বলপুর, জয়পুর ও দিল্লিতে বাঙালি ডাক্তার, শিক্ষক ও আইনজীবী নিজ নিজ পেশাদারি কর্মে নিযুক্ত হলেন। পেলেন অর্থ, সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা।

ইতিমধ্যে বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভোল গিয়েছে পালটে। স্বাধীনতা শুধু ভারতবর্ষে আসেনি, আগের দিনের অনেক উপনিবেশই আজ স্বাধীন। এইসব নতুন স্বাধীন দেশের অনেকগুলিতেই কায়েম হয়েছে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যাকে বলে নয়া-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, নিও-কলোনিয়ালিজম। বিভিন্ন প্রাক্তন কলোনির মধ্যবিত্ত সমাজে নয়া-কলোনিয়াল ব্যবস্থা যে রূপান্তর ঘটিয়েছে তা মোটেই অগভীর নয়। অবস্থার এই বদল মধ্যবিত্তের স্বার্থের বদল ঘটিয়েছে, স্বার্থের বদল মধ্যবিত্তের মানসিকতায় বদল ঘটিয়েছে।

''জন্মলগ্ন থেকেই মধ্যবিত্ত সমাজ বিত্ত ও মর্যাদার দিক থেকে, শিক্ষা ও সুযোগ-সবিধার দিক থেকে উঁচু, নিচু নানা স্তরে বিভক্ত ছিল। স্তরগুলি কঠিনভাবে রুদ্ধদ্বার এমন নয়, নিচু থেকে উঁচুতে ওঠার দৃষ্টান্ত অনেক মিলবে, তাহলেও ক্রমিক স্তরভাগ বেশ সু-উচ্চারিত। এর মধ্যে উপরের দিকের স্তরগুলির স্বার্থ এবং মানসিকতা সব সময় নিচের স্তরের স্বার্থ ও মানসিকতার সঙ্গে হুবহু মিলবে। সাংস্কৃতিক পার্থক্যও অনেকখানি। ইংরেজ আমলে জমিদারী প্রথা বিলোপের আগে পর্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চতম স্তরটি ছিল প্রধানত জমিদারদের নিয়ে গঠিত। এঁদের প্রায় কেউ খুব পুরানোকালের অর্থাৎ মোগল আমল বা তারও আগের কালের সামন্ত ধরণের জমিদার নন। এঁদের প্রায় সকলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি। এঁরা ছিলেন ইংরেজ কুঠির চারপাশে নতুন বড়লোক দালাল বা ব্যবসায়ী; হঠাৎ সঞ্চিত যে যে পুঁজিকে স্বাধীন বাণিজ্য পথে বা শিল্পায়ণের পথে চালিত করলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এঁরা ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারতেন, দেশজ পুঁজিবাদের অভিমুখে পা বাড়াতে পারতেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের টানে সেই পুঁজিকে এঁরা জমিতে নিযুক্ত করে ভুঁইফোঁড় জমিদার হয়ে বসলেন। এবং সর্বতোভাবে ইংরেজের সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করলেন।''[৬]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি বড় ফল হল ভূমির উপর নির্ভরশীল নানা স্তরের এবং ছোট, বড়-মাঝারি নানান মাপের মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি। ভূ-স্বামী হিসাবে উপরে জমিদার, আর উৎপাদক হিসাবে সবার নীচে চাষী, রায়ত। মাঝখানে তালুকদার, পত্তনিদার, জোতদার, ঠিকাদার, ইজারাদার এবং কৃষকদের শোষণকারী পর-শ্রমভোগী। অনেক ক্ষেত্রে এঁদেরই কেউ কেউ আবার মহাজনও।

আবার অন্যদিকে নগরের বৃত্তি ও চাকুরির মাধ্যাকর্ষণ যতই বাড়তে লাগল ততই গ্রামবাসী মধ্যস্বত্বভোগী অনেকেই শহরবাসী হতে লাগলেন। তাঁদের মনসিকতার মধ্যেও কিছু পরিমাণে পর-শ্রমভোগীর মানসিকতার প্রভাব টিকে রইল, প্রাচীন ধ্যান-ধারণার জেরও কিছু কিছু বজায় থেকে গেল।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ঃ

''মানুষের সমাজে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণি থাকে। এ স্তর ও শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। উৎপাদন পদ্ধতি থেকে শ্রেণির বিকাশ হয়। প্রত্যেক শ্রেণির একটি স্বতন্ত্র মর্যাদাবোধ গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক সঙ্গতি ও মর্যাদাবোধ শ্রেণি বিচারের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। মধ্যযুগের জীবন ছিল গ্রামীণ ভূমিকেন্দ্রিক। বংশ ও জমির মালিকানা দিয়ে শ্রেণি বিচার করা হত। সমাজ ছিল পরিবর্তন বিমুখ, স্থিতিশীল। আধুনিককালে এই অচলায়তন সমাজে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আধুনিককালে বাংলাদেশের সামাজিক গড়ণে ফাটল ধরে। কলকাতার নব্য ধনী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতারা কেউ অভিজাত ছিলেন না। কলকাতায় বাণিজ্য, শাসন ও জমিদারি পরিচালনার কাজে বহু লোকের দরকার হয়। বাংলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের লোকেরা ইংরেজদের অধীন দেওয়ান, বেনিয়ান, মুন্‌শী, খাজাঞ্জি, সরকার হিসাবে কাজ করে প্রচুর অর্থের মালিক হন। কলকাতার অভিজাত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতারা সকলে ইংরেজদের দেওয়ানি করে ধনী হন। বাঙালি বণিক জাতি শেঠ, বসাক, মল্লিক, লাহা, দত্ত, বিশ্বাস ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অনেকে চাকুরি ও ব্যবসা একসঙ্গে করেছেন। অর্থোপার্জনের আর একটি পথ ছিল ঠিকাদারি। আঠারো শতকে কলকাতায় বহু রকমের ঠিকাদারির কাজ ছিল। হাট, বাজার, লবণ, আফিমের ঠিকাদারি ছিল। ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবু বিলাসে' সম্ভব-অসম্ভব সব কর্মের হাদিস দিয়েছেন।''[৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেকে ব্যক্তিগত প্রতিভা বলে সমাজের উচ্চস্তরে উঠেছেন। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন হয়নি। সেজন্য বৃত্তি পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেনি। সর্দারি, জুয়াচুরি, পোদ্দারি, ভাড়ামি প্রভৃতি নতুন পেশার কথা ভবাণীচরণ বলেছেন। তার সঙ্গে ছিল দেওয়ানি, মুন্‌শীগিরি, বেণিয়ান, মুৎসুদ্দিগিরি, উজারাদারি ইত্যাদি। বাণিজ্য ছিল কিন্তু খুবই কম। ''বাংলাদেশে জাতি ও শ্রেণি সমার্থক নয়। সেজন্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক বাঙালি সমাজে ধনী, মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে নতুন শ্রেণির মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য লক্ষণীয়। মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। এর আকার বিশাল, গঠন জটিল। নগর ও মধ্যবিত্ত ছাড়া আধুনিক সভ্যতা অসম্ভব ছিল। আবার শিল্প-বাণিজ্য নির্ভর মধ্যবিত্ত ছাড়া রেনেশাঁস ও রিফরমেশন ঘটত

না। বাঙালির ভাল-মন্দের স্রষ্টা মধ্যবিত্ত। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদূত পত্রিকা প্রথম বাঙালি মধ্যবিত্তের কথা বলেছিল।"[৮] মধ্যবিত্তের আবির্ভাবের পূর্বে সব ধন ছিল ধনীদের হাতে। এতে সব মানুষ কষ্টে ছিল। মধ্যবিত্তের আবির্ভাব হওয়ায় এদেশে সুনীতি প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গদূত পত্রিকা মধ্যবিত্তের উত্থানের চারটি অর্থনৈতিক কারণ উল্লেখ করেছে। প্রথমটি জমির দাম বেড়েছে। দ্বিতীয়টি অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য। তৃতীয়টি ইউরোপীয়দের এদেশে আগমণ। এসবের ফলে বাংলাদেশে ধন বৃদ্ধি হয়েছে। চতুর্থ কারণটি হল মুদ্রা-নির্ভর অর্থনীতির বিস্তার। এসবের প্রত্যক্ষ ফল হল মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মধ্যবিত্ত বেশ সচ্ছল ছিল। গ্রামে বা শহরে তাদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। গ্রামে জমিদারি ও মধ্যসত্ব এবং শহরে চাকরি ও ব্যবসা নিয়ে মধ্যবিত্ত সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে গ্রামীণ মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তাদের এই সুখ ও স্বচ্ছলতায় ভাটা পড়ে। ছোট জমিদার, পত্তনিদার, গাঁতিদার, আমলা, নায়েব-গোমস্তা, তহশীলদার, কোর্ট-কাছারির কর্মচারী, দারোগা-পুলিশ, কারিগর ও অবস্থাপন্ন চাষীদের নিয়ে গড়ে ওঠে বাংলার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গ্রাম-বাংলার ওপর নাগরিক জীবনের প্রভাব পড়ে। গ্রামের মানুষ নগরজীবনমুখী হতে শুরু করে। স্বভাবতই মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

১৮৬৯ সনে অমৃতবাজার পত্রিকা মধ্যবিত্তের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে একে 'সমাজ বা অন্য বিপ্লবের' নেতৃত্ব পদে বসিয়েছিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত বিপ্লব করেনি, তবে সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। অল্পকাল মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখতে বাধ্য হয়েছিল যে ''মধ্যবিত্তের চাকরি ও ভূমি ইংরেজ শাসনের কল্যাণে বিপন্ন হয়েছে। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে প্রজাস্বত্ব আইনের দশধারা মধ্যবিত্ত গাঁতিদারদের সর্বনাশ করেছে। অমৃতবাজার পত্রিকার মতে এই আইনের ফলে জমিদার ও প্রজা লাভবান হয়েছে। হিতকর মধ্যবিত্তের ক্ষতি হয়েছে। আসলে মধ্যবিত্তের উপসত্বের বহু বিভাজনের ফলে তাদের আর্থিক সঙ্গতি নষ্ট হয়েছে।"[৯] বাংলার নাগরিক জীবন গড়ে উঠেছিল কলকাতার চাকরি, পেশা ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। এদেশে আধুনিক শিল্পায়ণ হয়নি। তাই শিল্প ও উপশিল্পের সঙ্গে যুক্ত উদ্যোগী মধ্যবিত্ত বাংলাদেশে ছিল না। তবে নগরায়ন ও বাণিজ্য বিচিত্র কর্মকান্ডের সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার, কারিগর, আইনজীবী, শিক্ষক ও কেরাণীদের নিয়ে বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্ত গঠিত হয়। প্রথম থেকে বাঙালিরা সরকারি ও বেসরকারি সদাগরি অফিসে কেরানীর কাজ করত। বেতন ছিল চার থেকে কুড়ি টাকা। নাগরিক মধ্যবিত্তের মধ্যে ছিলেন সরকারবাবুরা। সরকারবাবুরা ইংরেজ ও এদেশীয় ধনীদের নানা কাজে করে দিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। এরা উমেদারি ও মোসাহেবিকে চারুকলার পর্যায়ে নিয়ে যান। এরা ছিলেন

নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রথম পর্বের লোক।

দ্বিতীয় পর্বে (১৮১৭-৫৭) ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়েছে। ''বাঙালি মধ্যবিত্ত ইংরাজি শিখে সরকারি চাকরির আশায় কলকাতায় এসে ভিড় করেছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বিচিত্র ধরনের কাজ ছিল। ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত একচেটিয়াভাবে এসব কাজ পেত। এই বাঙালি মধ্যবিত্তের বেশিরভাগ ছিল বাঙালি হিন্দু। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে বাঙালি মুসলমান সরকারি চাকরি পায়নি। তবে বাঙালি মধ্যবিত্তের চাকরি ছিল নিম্নস্তরের, উচ্চস্তরের চাকরি ইংরেজদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। নগরায়ণের সঙ্গে যে চাকরি বেড়েছিল তা ছিল সীমিত। ফলে চাকরি প্রার্থীদের সংখ্যা বাড়ে, সমস্যা দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালি ইংরাজি শিখতে শুরু করে। ইংরাজি শেখানোর স্কুল-কলেজ ছিল না। কিছু বাঙালি বা ফিরিঙ্গি ইংরাজি শেখাতেন। ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় পুষ্ট বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব হয়। এরা যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সমাজ ও জগৎকে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। এরাই হলেন তাই আধুনিক বাংলার বৌদ্ধিক নেতা। বাঙালি বুদ্ধিজীবী দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন করেন। সমাজ-সংস্কার কর্মে এরা ছিলেন অগ্রণী।''[১০]

১৮১৩ থেকে সরকারি উদ্যোগে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৩৫ সনে মেকলে ও বেন্টিঙ্ক ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করেন। প্রাচ্যবাদী ও প্রাতীচ্যবাদীদের দ্বন্দ্বের অবসান হয়। ইউলিয়ম এ্যাডাম এদেশের প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাচ্যবিদ্যা নির্ভর জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের সুপারিশ করেন। মেকলের মত তিনিও filtration theory-র সমর্থক ছিলেন। মেকলের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তোলা। এরা হবেন শাসক ইংরেজ ও শাসিত ভারতবাসীর মধ্যে সেতুবন্ধন। রঙে ও রক্তে এরা ভারতীয় হলেও রুচি, নীতিবোধ ও চিন্তাভাবনায় এরা হবেন খাঁটি ইংরেজ। ইংরেজি শিক্ষালাভ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইংলন্ডের প্রতি অনুগত থাকবে। মেকলে আশা করেছিলেন এরা পৌত্তলিকতা থেকে সরে আসবে। মেকলের এই আশা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত রুচি, নৈতিকতা ও মানসিকতায় ইংরেজ হয়নি। খানিকটা ব্যতিক্রম ইয়ং বেঙ্গল দল। ইংরেজি শিক্ষা উচ্চ থেকে নিম্নগামী হবে বলে মেকলে যে আশা করেছিলেন তাও পূরণ হয়নি। সাধারণত দেখা যায় তিনটি নীতির ওপর ভিত্তি করে বুদ্ধিজীবী গড়ে উঠেছে। এই তিনটি নীতি হল বংশ, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। আধুনিককালে বংশ ও সম্পত্তির চেয়ে কৃতিত্ব বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। আধুনিককালে বিদ্যা ও বিত্ত পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত বিদ্যা ও বিত্তের জোরে সামাজিক মর্যাদায় উন্নত স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি সামাজিক মর্যাদা লাভ করলে পরবর্তী

কয়েক প্রজন্ম তার ফলভোগ করতে পারে। সমাজের প্রভু হয়ে বসেন বিত্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে তারা বিদ্যালব্ধ প্রতিষ্ঠা যুক্ত করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক বাঙালি বিদ্যা অর্জন করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিদ্যা থেকে আসে বিত্ত, বিত্ত থেকে প্রতিষ্ঠা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরকম বহু বাঙালি ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও এরা বেশ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। অনেকে বিদ্বৎ সমাজের নেতৃত্বও দিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার হয়। মাতৃভাষা অবহেলিত হয়। সকলে ইংরেজি শিখে সরকারি চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীন ব্যবসা বা শ্রমসাধ্য কাজে শিক্ষিত বাঙালির উৎসাহ ছিল না। এর কারণ ধনী ব্যবসায়ীর সরকারি চাকরিজীবীর মত সামাজিক মর্যাদা ছিল না। বাঙালি সমাজে ইংরেজ আমলে শিক্ষিত মানুষের বেশ কদর ছিল। ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সামাজিক গতিশীলতা দেখা দেয়। কৃষকের সন্তান লেখাপড়া শিখে চাকরি করে 'ভদ্র' হবার চেষ্টা শুরু করে দেয়। ধোপা, নাপিত, ছুতোর, মেথর, কেরাণি, বিল সরকার ও দালালির কাজে নিযুক্ত হবার চেষ্টা করে। কলকাতার বাইরে ইংরাজি-বাংলা স্কুল স্থাপিত হলে কৃষক ও কারিগর পরিবারের সন্তান ইংরাজি শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। ইংরাজি শিক্ষা লাভ করে তারা চাকরিপ্রার্থী হয় কারণ তাদের জাতিগত পেশায় সমাজিক সম্মান ছিল না।

বাংলার রাজনৈতিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আধিপত্য স্থাপিত হয়। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ও ছোট জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এসব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেন। অভিজাত জমিদার ও ধনীরা শঙ্কিত হন। ১৮৯২ খ্রীঃ আইনের পর 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বাংলা সরকারের কাছে যে আবেদন করেছিল তাতে এই আশঙ্কা প্রকাশ পায়। বিত্ত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা উপেক্ষা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আইনজীবীরা দেশের জমিদার ও কৃষকদের স্বার্থের কথা মনে রাখে না। মনে রাখে না এটি কৃষি-প্রধান দেশ। বাংলার অভিজাতরা মধ্যবিত্তের সম্প্রসারণে বাধা দিতে পারেনি। বাঙালি আইনজীবীর সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। স্বাধীন বৃত্তি অনুসরণ করার জন্য তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারতেন।

ইংরেজি শিক্ষার ফল হল পাশ্চাত্য ভাব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু তার ঐতিহ্য থেকে সরে আসে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে। ধর্মের প্রতি উদাসীনতা তার তৈরি হয়। পারিবারিক জীবনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সোমপ্রকাশ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই দ্বন্দ্বের আভাস

দিয়েছে। ঐতিহ্যগত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ অনেকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য ভাব দেশের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সমাজ সংস্কার আন্দোলনে উভয় গোষ্ঠির দান ছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি বড় অবদান। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজের দোষগুণ বিচার করতে শুরু করেন। শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমতার দাবী ওঠে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধ থেকে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব হয়েছে। জাতীয়তাবাদ প্রচারে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তাতে নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্পায়ণ না হবার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক ভিত ছিল দুর্বল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ হয়নি। বাংলাদেশে যৌথ পরিবার দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। কিন্তু পারিবারিক শান্তি বা স্থৈর্য আসেনি। দেশী ও বিদেশী ভাবধারার দ্বন্দ্বে সমাজে টানাপোড়েন বেড়েছে। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজও এই টানাপোড়েন থেকে মুক্ত ছিল না। পরবর্তী অধ্যায়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে মূলত পুরুষ চরিত্রগুলোর নিরিখে এই টানাপোড়েনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস রয়েছে।

সূত্রনির্দেশ

১. ভি. আই. লেনিন, কলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২৯, মস্কো, ১৯৬৯, পৃঃ ৪২১।

২. জে. এইচ. রুমফিল্ড, ঐ, পৃঃ ৫১৪।

৩. মহম্মদ ইদরিশ আলী, বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত, পৃঃ ৫২।

৪. তদেব, পৃঃ ৬৯।

৫. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - অক্টোবর ১৯৯৮, পৃঃ ২৪।

৬. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ৩৭।

৭. বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।

৮. তদেব, পৃঃ ১৬৩।

৯. তদেব, পৃঃ ১৬৪।

১০. তদেব, পৃঃ ১৬৫।